International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-IX, Issue-II, March 2023, Page No.25-32
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v9.i2.2023.25-32

কমল রায় চৌধুরীর দেবো না তিতুন’ নাটক: বিশ্লেষণ

ড. রাজীব চন্দ্র পাল
অতিথি অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, দূরশিক্ষা বিভাগ, ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়, সূর্যমণিনগর, আগরতলা, ভারত

Abstract

Dramas have been practiced, performed and staged since the Rajnya period in the state of Tripura in northeastern India. An established dramatist in modern phase in Tripura is Kamal Roy Chowdhury. In his plays he has brought out the history of ancient Tripura as well as the social evolution of modern Tripura. One of his notable plays is 'Debo Na Titun'. The drama portrays the reality of the 'Titun Pratha' or free begar khata practice in Tripura's monarchical regime. The dramatist has given importance here to the movement of public education association, public rebellion, establishment of communism, establishment of schools in villages, stopping political dictatorial exploitation, creating a society free from exploitation. The play has also been recognized as a historical example of Tripura. And this topic has been highlighted analytically in the discussion article.

Key word: Drama in Tripura, Royal History of Tripura, Kamal Roy Chowdhury, Devo Na Titun, Public Education Movement, Titun tradition, Jamai Khata tradition

(এক)

নাটক অত্যন্ত সংবেদনশীল সমাজ দর্পণ। নাট্যশিল্পী ও নাট্য কলাকুশলীদের সমাজ সচেতনতা বোধে নাটকের অবয়বে সমাজ জীবন বাস্তবতার প্রতিচ্ছবি রূপায়িত হয়। জীবনের ও সমাজের প্রতিচিত্রের উপস্থাপনগত শিল্প নৈপূণ্য প্রদর্শন ও মঞ্চায়নের মধ্যেই নাটকের সার্থকতা এবং নাট্যকারের প্রতিভার প্রকাশ ঘটে। ত্রিপুরার নাট্য প্রযোজনা ও নাটক রচনার ইতিহাস সুপ্রাচীন। রাজন্য আমলেই এখানে নাটক রচনা ও অভিনয়ের সূচনা হয়। ক্রমে রাজান্তপুর ছাড়িয়ে নাট্যকর্মীদের নিরলস প্রয়াসে ত্রিপুরার নাটক চর্চা আজ সফলতার চূড়ান্ত শীর্ষ স্পর্শ করেছে। নাট্যকার, নট ও মঞ্চ এই তিনের সম্মিলনে ত্রিপুরার নাট্যচর্চার জগৎটি বর্তমানে সাহিত্যচর্চার বৃহত্তর পরিসরে গুরুত্বপূর্ণ মর্যাদার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

ত্রিপুরা উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রান্তীয় রাজ্য হলেও সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার একটা স্বতন্ত্র পরিসর রয়েছে। রাজশাসিত সময় থেকেই রচিত হয়েছে নাটক এবং সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চায়িত হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে বক্ষ্যমাণ আলোচনায় ত্রিপুরার প্রথম নাটক, প্রথম থিয়েটার ও মঞ্চ এবং প্রথম অভিনয়ের তথ্য দেওয়া যেতে পারে-

ক) ত্রিপুরার প্রথম নাট্য প্রযোজনা ও অভিনয় হয় রাজধানী ‘রাঙ্গামাটি’তে (বর্তমান উদয়পুর)। সময়কাল ১৬৮২ খ্রিস্টাব্দ। অসমের রাজা স্বর্গদেব রুদ্রসিংহ প্রেরিত দূত রত্নকন্দলী ও অর্জুন দাস

বৈরাগীর সম্মানার্থে 'কালীয়দমন' নাটক অভিনয় করা হয়। রাজা দ্বিতীয় রত্নমাণিক্য স্বয়ং অভিনয় করেন। নাট্য ব্যক্তিত্ব স্বপন ভট্টাচার্য লিখেছেন :

> "উদয়পুরে যখন ত্রিপুরার রাজধানী ছিল তখন থেকেই নাট্য চর্চার সূত্রপাত ঘটে। দ্বিতীয় রত্নমাণিক্য (১৬৬৫-১৭১২) স্বয়ং 'কালীয়দমন' পালায় অভিনয় করেন ১৬৮২ খ্রীস্টাব্দে।" [১]

খ) ত্রিপুরার প্রথম থিয়েটার বা মঞ্চ 'উজ্জয়ন্ত নাট্যসমাজ' ১৮৯২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠাতা মহারাজা রাধাকিশোর মাণিক্য। পৃষ্ঠপোষক বীরেন্দ্র কিশোর মাণিক্য। সংগঠক ও নির্দেশক মহারাজকুমার মহেন্দ্র দেববর্মন ও ব্রজেন্দ্র মুখোপাধ্যায়। অভিনীত নাটক 'কল্যানী'। শক্তি হালদার ' ত্রিপুরার নাট্য আন্দোলনের ধারা' গ্রন্থে লিখেছেন:

> "১৮৯২ সনে যুবরাজ রাধাকিশোর গঠন করেন 'উজ্জয়ন্ত নাট্যসমাজ'। 'উজ্জয়ন্ত নাট্যসমাজ' এর হাত ধরেই ত্রিপুরার ধারাবাহিক নাট্যচর্চার সূত্রপাত।"[২]

গ) ত্রিপুরার রচিত প্রথম বাংলা নাটক 'পতিব্রতা'। নাট্যকার মহারাজ কুমার মহেন্দ্র দেববর্মন। রচনাকাল ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দ। সমাজ সংস্কারের গুরুত্বপূর্ণ গণমাধ্যম হচ্ছে নাটক। নাটকে দেশ- কাল- সমাজ- রাজনীতি প্রধান বিষয় হয়ে ওঠে । নাট্যকারের সমাজ অভিজ্ঞতায় নাটকে রূপায়িত হয় ফেলে আসা সমাজ ইতিহাস । কখনো কখনো সেই সমাজ ইতিহাস একালীন বাস্তব হয়ে ওঠে।

ত্রিপুরার নাট্যচর্চার ইতিহাসে কমল রায় চৌধুরী এমনই একজন নাট্যকার যিনি সমাজ ও ইতিহাসকে নাটকে যথাযথভাবে উপস্থাপনের দক্ষতা দেখিয়েছেন। ১৯৭০ সালে 'লেনিন' পথ নাটক দিয়ে নাট্যজগতে তার অভিষেক ঘটে। যদিও নাটকটির অভিনয় হয়নি। এরপর 'বাঁচতে হলে', 'পুনর্জন্ম' , 'ধর্মগোলা', 'দোলনা', 'অতিক্রমণের ক্রন্দন', 'সূর্যোদয়', 'ত্রিপুর রাজার উপখ্যান' প্রত্যেকটি নাটকে তিনি সমাজ অভিজ্ঞতার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। 'দেবো না তিতুন' নাটকে নাট্যকারের সমাজ সচেতনতার বিচিত্র মাত্রা ধরা পড়েছে। কমল রায় চৌধুরী এই নাটকে জনশিক্ষা সমিতি আন্দোলন, গণতন্ত্রের উত্থান, রাজতন্ত্রের অবসান, প্রভৃতি রাজতান্ত্রিক সমাজ ইতিহাসের কথা বলেছেন। বক্ষ্যমাণ নিবন্ধে 'দেবো না তিতুন' নাটকের এ সমস্ত বিষয়ের সামগ্রিক আলোচনার প্রয়াস করা হয়েছে।

(দুই)

পটভূমি: কমল রায় চৌধুরী আদ্যোন্ত নাট্যপ্রাণ ব্যক্তিত্ব। তিনি মার্কসবাদী ভাবধারায় বিশ্বাসী ও সাম্যবাদী মতাদর্শে লালিত। তদুপরি তার নাটকের মূল বিষয় ও পটভূমি হিসেবে উঠে এসেছে ত্রিপুরার সমাজ- ইতিহাস -রাজনীতি। 'দেবো না তিতুন' নাটকের মূল পটভূমি ত্রিপুরার খোয়াই জেলার পদ্মবিল গ্রাম। সময়কাল ১৯৮০ সাল। ৮০ এর দশকে সারা ত্রিপুরা জুড়ে ভ্রাতৃঘাতি দাঙ্গা জনজীবনকে বিধ্বস্ত করে দেয়। আদিবাসী বাঙালি বিরোধ চরম রূপ নেয়। ৮০ সনের দাঙ্গা ত্রিপুরার ইতিহাসে স্থান পায়। দেখা দেয় দুর্ভিক্ষ। খাদ্য- বস্ত্র -বাসস্থানের সঙ্কট দেখা দেয়। সেই প্রেক্ষাপটেই নাট্যকার 'দেবো না তিতুন' নাটক রচনা করেন। ত্রিপুরার রাজ আমলে বিনা পয়সায় প্রজাদের বেগার খাটতে হয়। একে বলা হয় 'তৈথুং' বা 'তিতুন প্রথা'। রাজা কিংবা রাজকর্মচারীদের জন্য প্রজাদের খেটে দিতে হত। কোন মজুরি দেওয়া হত না। এরই বিরোধিতা প্রজাদের মধ্যে দেখা দেয় । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় একবার ত্রিপুরায় ফসল বিশেষ হয়নি। ঘরে ঘরে খাবারের অভাব। কিন্তু রাজারা খাজনা আদায়ে প্রজাদের উপর জুলুম করে। রাজ প্রতিনিধি দল খোয়াইয়ের পদ্মবিল গ্রামে খাজনা আদায় কালে গ্রামের মানুষ বেঁকে বসেন। তারা তিতুন দিতে অস্বীকার করেন।

বিদ্রোহের আঁচ পেয়ে রাজা নামিয়ে দেন মিলিটারি সৈন্য। ত্রিপুরার রাজাদের প্রজা বিদ্রোহ দমনের নৃশংসতার দৃষ্ঠান্ত অনেক। আগ্রহী পাঠক এবিষয়ে পান্নালাল রায়ের ‘ত্রিপুরায় রাজ আমলে প্রজা বিদ্রোহ’[৩] বইটি দেখে নিতে পারেন।

পদ্মবিল গ্রামে রাজায়-প্রজায় বিরোধ সংঘর্ষের রূপ নেয়। পুরুষরা লুকিয়ে পড়েন জঙ্গলে। মহিলারা প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। রাজনির্দেশে মিলিটারির গুলিতে ১৯৪৯ সালের ২৮ মার্চ মধুতি দেব্বর্মা, কুমারী দেব্বর্মা, রূপশ্রী দেব্বর্মা তিন বোন শহীদ হন। সে বছরই অর্থাৎ ১৯৪৯ সালের ১৫ অক্টোবর ত্রিপুরা ভারতভুক্ত হয়। ত্রিপুরার রাজ শাসনের অবসান ঘটে। খোয়াইয়ের এই ইতিহাসেকে তথ্য করে কমল রায় চৌধুরী ‘দেবো না তিতুন’ নাটক রচনা করেন।

‘দেবো না তিতুন’ নাটকের ১টি প্রারম্ভিক দৃশ্য, ২৭ টি মূল দৃশ্য, ও ৬ টি অন্তর্দৃশ্য রয়েছে। নাটকটি প্রথম অভিনীত হয়েছে ১৯৮২ সালের ১১ জুলাই। খোয়াইয়ের নাট্যসংস্থা ‘কালচারাল ক্যাম্পেইন’ এর পক্ষে পুরনো টাউন হলে প্রথম অভিনীত হয়েছে। এবছরই নাটকটির ৩৭ টি অভিনয় ত্রিপুরার খোয়াই, আগরতলা, মানিকভাণ্ডার, গোলাঘাটি, সাতচাঁদ, সাব্রুম, বিলোনিয়া, কৈলাশহর, ধর্মনগর, শিলচর, কলকাতা, উদয়পুর, সোনামুড়া, প্রভৃতি অঞ্চলে অনুষ্ঠিত হয়েছে। নারায়ন দেবনাথ ‘ত্রিপুরার নাট্য প্রযোজনার ইতিহাস’ [৪] গ্রন্থে ‘দেবো না তিতুন’ নাটকের প্রথম অভিনয়ের বিস্তৃত তথ্য দিয়েছেন। অনুসন্ধিৎসু পাঠক দেখে নিতে পারেন । নাটকের সার্থকতা তার জনপ্রিয়তা ও মঞ্চায়নের উপর নির্ভর করে। ‘দেবো না তিতুন’ নাটকের এই ৩৭ টি অভিনয়ের দৃষ্টান্ত নাটকটির জনপ্রিয়তা ও নাট্যকারের কৃতিত্বের প্রামাণ্যতা বহন করে চলেছে।

(তিন)

জনশিক্ষা সমিতির প্রভাব: ত্রিপুরার ঐতিহাসিক ইতিবৃত্তে জনশিক্ষা সমিতি আন্দোলন বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। পৃথিবীর আর কোথাও এরকম শিক্ষা আন্দোলন সংগঠিত ও বাস্তবায়িত হয়েছে বলে জানা নেই। ত্রিপুরায় প্রায় ১৮৪ জন রাজা আনুমানিক ৪৫০ বছর রাজত্ব করেছিলেন। রাজারা প্রত্যেকেই উপজাতি অংশের ছিলেন। কিন্তু তারা উপজাতি আদিবাসী জনগণের শিক্ষার প্রসারে ও সামগ্রিক উন্নতিতে সানুরাগী ও আগ্রহী ছিলেন বলে মনে হয় না। ফলে রাজ শাসনের সময় কালেই ত্রিপুরায় মার্কসীয় ভাবাদর্শে জনশিক্ষা সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। ‘দেবো না তিতুন’ নাটকে এর প্রভাব পড়েছে।

ত্রিপুরায় জনশিক্ষা সমিতির প্রতিষ্ঠা দিবস ১৯৪৫ সালের ২৭ ডিসেম্বের , ১৩৫৫ ত্রিপুরাব্দের ১২ পৌষ, ১৩৫২ বঙ্গাব্দের ১২ পৌষ, বৃহস্পতিবার। স্থান আগরতলা সদর দুর্গাচৌধুরী পাড়া হেমন্ত দেব্বর্মার বাসভবন। সভাপতি সুধন্বা দেব্বর্মা। সহ সংঘঠক দশরথ দেব্বর্মা, হেমন্ত দেব্বর্মা, অঘোর দেব্বর্মা। জনশিক্ষা সমিতির মূল উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষার আলোক বর্তিকা ছড়িয়ে দিয়ে আদিবাসী উপজাতি স্তরের মানুষের মধ্যে গণতান্ত্রিক চেতনার বিকাশ ঘটানো। এই আন্দোলনের ফলে রাজ্যে শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন আসে। রাজ পরিমণ্ডল এই আন্দোলনে বাধা দেয়, কিন্তু প্রজারা প্রতিবাদ করে শিক্ষার অধিকার ছিনিয়ে নেয়। শুধু ‘দেবো না তিতুন’ নয়, হীরেন্দ্র সিনহার ‘সন্ধিকাল নাটক’[৫] সুধন্বা দেব্বর্মার ‘হাচুক নি খুরিঅ’ (পাহাড়ের কোলে)[৬] উপন্যাসে, বিমল সিংহের ‘লংতরাই’ [৭] উপন্যাসে, নন্দকুমার দেব্বর্মার ‘অতলান্তিকা’ [৮] উপন্যাসে এই জনশিক্ষা সমিতির প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়েছে।

‘দেবো না তিতুন’ নাটকের পরতে পরতে ছড়িয়ে রয়েছে জনশিক্ষা সমিতি আন্দোলনের রূপরেখা। রামকুমার চরিত্র এই সমিতির নেতা। পদ্মবিল গ্রামে আদিবাসী অঞ্চলে বিদ্যালয় স্থাপন, শিক্ষা প্রসার জন জাগরণ সমস্তই নাট্যকার রামকুমার চরিত্রের মাধ্যমে দেখিয়েছেন। রামকুমার রাজশক্তির রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে গ্রামে গ্রামে জনশিক্ষা সমিতির বার্তা নিয়ে ঘুরেছেন। রামকুমার প্রজাদের বোঝাচ্ছেন যে, পৃথিবীর অন্যান্য দেশ আজ কত উন্নত, অথচ ত্রিপুরায় এখনো শিক্ষার সুযোগ নেই। রামকুমার নাটকের তৃতীয় দৃশ্যের অন্তর্দৃশ্যে বলেছেন:

> “আমরা সারা ত্রিপুরায় শিক্ষা বিস্তারের জন্য রাজার কাছে দাবী করছি। গ্রামে গ্রামে স্কুল করে দেবার কথা বলেছি – কিন্তু রাজা আমাদের দাবী মানেন নি। আমরা তাই সারা ত্রিপুরায় জনশিক্ষা আন্দোলন গড়ে তুলব–আর পাশাপাশি যত দিন না রাজা স্কুল করে দেয়, ততদিন আমরা নিজেরাই গ্রামে গ্রামে স্কুল গড়ে তুলব -নিজেরাই চালাব।” [৯]

নাটকে আমরা দেখতে পাই ত্রিপুরার রাজসভায় (চরিত্র নামহীন) মহারাজা, মন্ত্রী, পুরোহিত, সেনাপতি, দ্বারী, ভৃত্য, চৌধুরী, তহশীলদার সকলেই জনশিক্ষা সমিতির বিরোধী। ষোড়শ দৃশ্যে রাজ পরিষদবর্গের কথোপকথনে এই তথ্য নাট্যকার দিয়েছেন। জনশিক্ষা সমিতির প্রভাব কিভাবে আটকে দেওয়া যায় রাজসভায় তা আলোচিত হয়। প্রজাদের মূর্খ করে রেখে দিনের পর দিন, প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে কিভাবে শোষণ করা যায় তারই বাস্তবতা নাট্যকার দেখিয়েছেন।

রাজ পুরোহিত বলেছেন:

“নহে শুভবুদ্ধি মন্ত্রীবর,
শিক্ষা পেলে মূর্খ দল নবশক্তি পাবে।” [১০]

মহারাজ বলেছেন:

“ক্ষতি নাহি তাতে? মন্ত্রীবর,
ধুলি লুণ্ঠিত হয় যদি রাজমুকুট
শিরচ্ছেদ বলে তারে। নাহি হবে তাই
একটিও বিদ্যালয় তাদের তরে।” [১১]

রাজ বিরোধিতা সত্ত্বেও রাজকুমারের নেতৃত্বে জনশিক্ষা সমিতির কর্ম প্রক্রিয়া চলতে থাকে। প্রতিবাদ গড়ে ওঠে। রাজার পাঠানো মিলিটারির গুলিতে শহিদ হন কুমারী, মধুতি, রূপশ্রী তিন বোন। প্রতিবাদে সামিল হয় পাহাড়ি জনপদ। মংকুরুই, নগুরাই, হীরামতি, লক্ষ্মীচরণ, সকলের সম্মিলিত প্রয়াসে শিক্ষা বিস্তার চলতে থাকে। নাটকের ২০তম দৃশ্যে পদ্মমোহনের সংলাপে জনশিক্ষা সমিতির বাস্তব প্রভাব নাট্যকার দেখিয়েছেন:

> “জনশিক্ষা আন্দোলন কইর‍্যা মানুষ রাজারে চিনল। এই রাজা আবার শত্রু। একটা ইস্কুল পর্যন্ত বানাইত দেই না। এর মইধ্যে মহারাজ বীরবিক্রম মইর‍্যা গেলেন। রাজা মরলে কি অইব! তার লুকজন পাত্রমিত্র ত মরছে না। হেরা অত্যাচার চালাইল আরও বেশি। গ্রামে গ্রামে যায় খাজনা আদায় করার লাইগ্যা। জুলুম করে। গ্রামে মিলিটারি গেলে তারার মালপত্র বয়ায় মানুষেরে দিয়া বিনা পয়সায়। মানুষ কয় রাজা মইর‍্যা গেছে গা, আবার তিতুন দিতাম কেরে। জুলুম থিক্যা

> বাঁচনের লেইগ্যা মানুষ জোট বান্ধল নতুন কইর্‌্যা। জনশিক্ষা সমিতির নাম পাল্টাইয়া নাম রাখল 'গণমুক্তি পরিষদ'। [১২]

চার

রাজতন্ত্র থেকে গণতন্ত্রে উত্তরণ: 'দেবো না তিতুন' নাটকের অন্তর্বয়ানে রাজতন্ত্র থেকে গণতন্ত্রে উত্তরণ স্বতন্ত্র মাত্রা সংযোজন করেছে। সাড়া জাগানো এই নাটক ত্রিপুরার রাজ ইতিহাসের জীবন্ত দলিল। অত্যাচারের বিরুদ্ধে জনগণমনের প্রতিবাদ ও উঠে দাঁড়ানোর মানপত্র হচ্ছে এই নাটক। ত্রিপুরার রাজারা যে খুব বেশি প্রজা বৎসল ছিলেন না ইতিহাস তা জানান দেয়। কিন্তু সমাজ চিরকাল একই রকম চলতে পারে না। বিবর্তন- পরিবর্তন- গ্রহণ-পরিশোধন সমাজে চলতে থাকে। ত্রিপুরার রাজতান্ত্রিক পরিমণ্ডলেও মোড় ফেরা শুরু হয়।

'দেবো না তিতুন' নাটকের প্রারম্ভিক দৃশ্যেই নেতা চরিত্রের সংলাপে রাজতন্ত্রের অবসান এবং গণতন্ত্রের উত্তরণ নাট্যকার দেখিয়েছেন:

> "নেতা: গণমুক্তি পরিষদের ডাকে তখন ত্রিপুরাবাসী লড়াই করছিলেন গণতন্ত্রের জন্যে, স্বায়ত্বশাসনের জন্যে। ত্রিপুরার পাহাড়ে পাহাড়ে অরণ্য কন্দরে এই আওয়াজ উঠেছিল– 'প্রজার ভোটে মন্ত্রী চাই। রিজেন্ট শাসন বাতিল করো। রাজতন্ত্র বাতিল করো । গণতন্ত্র কায়েম করো'।" [১৩]

ত্রিপুরার রাজতন্ত্রের অবসানের জন্য গড়ে ওঠে বিভিন্ন সংঘটন যেমন-

ক) ১৯২৭-এ 'ছাত্র সংঘ'।
খ) ১৯২৮-এ 'ভ্রাতৃ সংঘ'।
গ) ১৯৩৮-এ 'ত্রিপুরা রাজ্য গণ পরিষদ'।
ঘ) ১৯৩৮-এ 'ত্রিপুরা রাজ জনমহল সমিতি'।
ঙ) ১৯৪৫-এ 'জনশিক্ষা সমিতি'।
চ) ১৯৪৬-এ 'ত্রিপুরা জাতীয় কংগ্রেস'।
ছ) ১৯৪৭ - এ 'ত্রিপুরা সংঘ'।
জ) ১৯৪৮ এ 'ত্রিপুরা রাজ্য গণমুক্তি পরিষদ', প্রভৃতি ।

'দেবো না তিতুন' নাটকে এই আন্দোলন গুলির প্রভাব রয়েছে। আদিবাসী উপজাতি পাহাড়ি জনপদের মানুষ প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছেন। তারা আর রাজতন্ত্রের অন্যায় শাসন চান না। আর জুলুম নয়। প্রজাদের মধ্যে মুক্তির বাণী ঘনীভূত হয়। শিক্ষা,স্বাস্থ্য,সংস্কৃতি, জামাইখাটা প্রথা, ডাইনি প্রথার বিলোপ প্রভৃতি সম্পর্কে প্রজারা সচেতন হয়ে ওঠেন। রাজ সনদ কেঁপে ওঠে। রাজ পরিষদবর্গ বিচলিত হন। প্রজা জব্দ করতে মিলিটারির অত্যাচার শুরু হয়। কিন্তু প্রতিবাদ থেমে যায় না। জনশিক্ষা সমিতি থেকে গড়ে ওঠে গণমুক্তি পরিষদ। নাটকে নেতা রামকুমার রাজতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে গণতন্ত্রের ঘোষণা দিলেন:

> "রাজার অত্যাচার বন্ধ করতে হলে আমাদের লড়াই হবে রাজার সঙ্গে। রাজার সঙ্গে লড়াই বাঁধলে আসবে ব্রিটিশ। ব্রিটিশ ভারতবর্ষকে শোষণ করছে। ঐ ব্রিটিশকে তাড়ানোর জন্যে ভারতের মানুষ লড়াই করছেন- সে লড়াইয়ের সঙ্গে এক হয়ে আমাদের লড়তে হবে- লেখাপড়া শেখা হলো সেই লড়াইয়ের প্রথম প্রস্তুতি।" [১৪]

ত্রিপুরায় রাজতন্ত্রের অন্যায় অমানবিক নিষ্ঠুর শাসন একদিন স্তিমিত হবে এই প্রত্যাসায় সেদিন পদ্মবিল গ্রামের মানুষ সম্মিলিত হয়েছিল। নাটকে নরেন্দ্র বলেছে:

> "রাজার অত্যাচার বন্ধ করন লাগব"[১৫]

২৪তম দৃশ্যে মধুতি বলেছে:

> "আমরাও মানত না রাজারে – মাইর‍্যা ফালাও তবু মানত না" [১৬]

নাটকে এভাবেই রাজতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে গণতন্ত্রের জয় ধ্বনির শ্লোগান শোনা যায়। মিলিটারির গুলিতে কুমারী, মধুতি ও রূপশ্রীর আত্মবলিদানের মধ্য দিয়ে এই আন্দোলন আরো জোড়ালো হয়ে ওঠে। শুধু 'দেবো না তিতুন' নাটক নয়, কমল রায় চৌধুরী 'ধর্মগোলা' [১৭] নাটকটিতেও রতনমণি রিয়াং এর রিয়াং বিদ্রোহের মধ্যদিয়ে গণতন্ত্রের জাগরণের কথা বলেছেন।

পাঁচ

'দেবো না তিতুন' নাটকের ২৭টি দৃশ্যের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তিতুন প্রথার বর্ণনা রয়েছে। তিতুন প্রথার উল্লেখ করে নাটক শুরু হয়েছে এবং 'দেবো না তিতুন'শ্লোগান দিয়ে নাটকের অন্তিম পর্দা পড়েছে। সঙ্গে যুক্ত হয়েছে জামাইখাটা প্রথা ও ডাইনি প্রথার বিলোপের দৃষ্টান্ত। তিতুন প্রথার বিরোধিতা করে কুমারী, মধুতি রূপশ্রী শহীদ হওয়ার ঘটনা ত্রিপুরার প্রথম গণতান্ত্রিক আন্দোলন। তিতুন প্রথার আরেক নাম নিষ্ঠুরতা।

নাটকে আমারা দেখতে পাই লক্ষ্মীচরণ অসুস্থ শরীর নিয়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাজ কর্মচারী চৌধুরীর জন্য তিতুন খাটতে যান। কেননা প্রজারা নিঃস্ব । শুধু নিঃস্ব নন অসহায়। তাদের প্রতিবাদের ভাষা নেই। তখনই জনশিক্ষা সমিতি ও গণমুক্তি পরিষদের ডাকে প্রজাদের চেতনা সঞ্চারিত হয়। এরপর প্রজারা আর তিতুন খাটতে চান না। তিতুন প্রথার অবসান হয়। কমল রায় চৌধুরী ত্রিপুরার এই রাজ ইতিহাসের চিত্রকেই আলোচ্য নাটকে রূপায়িত করছেন। নাটকের শেষ ২৭তম দৃশ্যে নেতা চরিত্রের সংলাপে নাট্যকার শোষণমুক্তির শ্লোগান লিখেছেন:

> "দেবো না তিতুন! দেবো না তিতুন"[১৮]

ছয়

'দেবো না তিতুন' নাটকের গঠন কৌশলেও নাট্যকার কমল রায় চৌধুরীর অপরিমেয় দক্ষতার প্রকাশ ঘটেছে । ভাষা ব্যবহার ও সংলাপ রচনার তিনি কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তেমনি নাটকের নতুন আঙ্গিকে তিনি দৃশ্যের মধ্যে অন্তর্দৃশ্য সংযোজনের অভিনবত্ব দেখিয়েছেন। সংলাপকে চরিত্রের ভাব অনুযায়ী ব্যাবহার করছেন। যেমন রাজা, পুরোহিত। মন্ত্রী, সেনাপতি প্রমুখ রাজপরিমণ্ডলের চরিত্রের সংলাপে তিনি আভিজাত্যময় ভাষা ব্যবহার করেছেন আবার নিম্নবর্গীয় শ্রমিক, কৃষক শ্রেণির চরিত্রের সংলাপে বাস্তব মুখের ভাষা ব্যবহার করেছেন । তবে উচ্চবিত্তের সংলাপে তিনি ততটা সার্থকতা দেখাতে না পারলেও নিম্নবর্গীয় শ্রেণির সংলাপ রচনার তিনি প্রতিভা উজাড় করে ঢেলে দিয়েছেন। আমরা দুটি শ্রেণির দুটি সংলাপ দৃষ্টান্ত হিসাবে তুলে ধরতে পারি-

১) অভিজাত শ্রেণির সংলাপ :

> “পুরোহিত: ভেদনীতি, দণ্ডনীতি, মিথ্যা প্রলোভন,
> তার সাতে যোগ কর পূজা আরাধনা,
> জপতপ, পরকাল, ব্রহ্মভক্তি, তবে
> সুরক্ষিত থাকে সিংহাসন, রাজ্যপাট।
> বিদ্যালয় শোভে অরণ্য মাঝারে?” [১৯]

২) নিম্নবর্গীয় আদিবাসী চরিত্রের মুখে বাংলা ভাষার সংলাপ:

> “হিরামতী: আর কতখানি পথ আছে, কেটা জানে, ইতা কুন জাগা! কুনু গেরামনি আছে কাছে? কেডা কইব !”[২০]

চরিত্র নির্মাণ কৌশলেও নাট্যকার দক্ষতা দেখিয়েছেন। দুটি বিশেষ শ্রেণির চরিত্র তিনি সৃষ্টি করেছেন। রাজসভা কেন্দ্রিক অভিজাত শ্রেণি। তবে এই শ্রেণির চরিত্র নির্মাণে ততটা সফলতা দেখাতে পারেন নি। যেমন -রাজা, মন্ত্রী, পুরোহিত, সেনাপতি, তহশিলদার, দারোগা,হাবিলদার, সেপাই প্রমুখ। কিন্তু অনভিজাত প্রজা শ্রেণির চরিত্র নির্মাণে তিনি বাস্তব অভিজ্ঞতার প্রকাশ করেছেন। এই শ্রেণির চরিত্র নির্মাণে তিনি সকল সার্থকতা দেখিয়েছেন। যেমন -রামকুমার, হিরামতী, কুমারী,মধুতি, রূপশ্রী, মুংকুরুই, মহেন্দ্র, নগুরাই, নরেন্দ্র, প্রমুখ।

আমাদের মনে হয় চরিত্র নির্মাণের চেয়ে নাট্যকার সমাজ ভাবনার বাস্তবায়নে বেশি গুরত্ব দিয়েছেন। ফলে সমাজ এই নাটকের প্রধান চরিত্রের ভুমিকায় উন্নীত হয়ে গেছে। নাটকে গানের প্রাসঙ্গিক ব্যবহারও উল্লেখযোগ্য । গানগুলিতে তিতুন প্রথা, জামাই খাটা, ডাইনি প্রথার বিলোপের সুর ধ্বনিত হয়েছে।

‘দেবো না তিতুন’ নাটক নিয়ে আরো বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ রয়েছে। পাশাপাশি অন্য নাট্যকারের সমধর্মী নাটকের সঙ্গে এর তুলনামূলক আলোচনার সুযোগ রয়েছে। আগ্রহী ও অনুসন্ধিৎসু পাঠক ত্রিপুরার নাটক চর্চা নিয়ে এবং ‘দেবো না তিতুন’ নিয়ে আরো মননসিদ্ধ সমীক্ষাত্মক ও বিশ্লেষণাত্মক রসগ্রাহী আলোচনা করবেন এই প্রত্যাশা রইল।

প্রসঙ্গক্রম ও মন্তব্য:

১) স্বপন ভট্টাচার্য ‘উদয়পুর নাট্য আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত রূপরেখা’, ‘স্মরণিকা’, সম্পাদক - অমৃত শিব, চন্দন ঘোষ স্মৃতি নাট্যোৎসব ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দ, রিক্রিয়েশন সেন্টার, উদয়পুর, ত্রিপুরা, পৃষ্ঠা – ৪০।
২) শক্তি হালদার, ‘ত্রিপুরার নাট্য আন্দোলনের ধারা’, বিশ্বজ্ঞান, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা বইমেলা ২০০২, পৃষ্ঠা – ১৩।
৩) দ্র. পান্নালাল রায়, ‘ত্রিপুরার রাজ আমলে প্রজা বিদ্রোহ’, ত্রিপুরা বানী প্রকাশনী, আগরতলা, প্রথম প্রকাশ, মার্চ ২০০৮।
৪) নারায়ণ দেব, ‘ত্রিপুরার নাট্য প্রযোজনার ইতিহাস’, অক্ষর পাবলিকেশন্স’ আগরতলা, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০২২, পৃষ্ঠা – ৩৮০-৩৮১।
৫) দ্র. হীরেন্দ্র সিন্হা, ‘সন্ধিকাল’, ‘পাখির চোখ ও রাজার সাজা’, পদধ্বনি প্রকাশন, আগরতলা, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০০৪।
৬) দ্র. সুধন্বা দেববর্মা, ‘পাহাড়ের কোলে’, অখণ্ড সংস্করণ, অক্ষর পাবলিকেশন্স, আগরতলা,প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০০৪।
৭) দ্র. বিমল সিংহের, ‘লংতরাই’, নবচন্দনা প্রকাশনী, আগরতলা, চতুর্থ সংস্করণ, ডিসেম্বর ২০১১।
৮) দ্র. নন্দ কুমার দেববর্মা, ‘উপন্যাস সমগ্র’, নীহারিকা পাবলিশার্স, আগরতলা,প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০২১।
৯) কমল রায় চৌধুরী, ‘দেবো না তিতুন’, ত্রিপুরা থিয়েটার, ষোড়শ বর্ষ, অক্টোবর ২০২১ সংখ্যা আগরতলা, পৃষ্ঠা – ৩১৯।
১০) কমল রায় চৌধুরী, ‘পূর্বোক্ত’, পৃষ্ঠা – ৩৩৬।
১১) কমল রায় চৌধুরী, ‘পূর্বোক্ত’, পৃষ্ঠা – ৩৩৭।
১২) কমল রায় চৌধুরী, ‘পূর্বোক্ত’, পৃষ্ঠা – ৩৪৩।
১৩) কমল রায় চৌধুরী, ‘পূর্বোক্ত’, পৃষ্ঠা – ৩১০।
১৪) কমল রায় চৌধুরী, ‘পূর্বোক্ত’, পৃষ্ঠা – ৩২০-৩২১।
১৫) কমল রায় চৌধুরী, ‘পূর্বোক্ত’, পৃষ্ঠা – ৩২০।
১৬) কমল রায় চৌধুরী, ‘পূর্বোক্ত’, পৃষ্ঠা – ৩৫০।
১৭) কমল রায় চৌধুরী, ‘ধর্মগোলা’, ‘অভিনয় ত্রিপুরা’, ষষ্ঠবর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা - ২০১৪, পৃষ্ঠা – ১১৭।
১৮) কমল রায় চৌধুরী, ‘দেব না তিতুন’, ‘পূর্বোক্ত’, পৃষ্ঠা – ৩৫৫।
১৯) কমল রায় চৌধুরী, ‘পূর্বোক্ত’, পৃষ্ঠা – ৩৩৬।
২০) কমল রায় চৌধুরী, ‘পূর্বোক্ত’, পৃষ্ঠা – ৩৩৮।